Question: অমল চরিত্র আখ্যানমূলক রচনায় 'চরিত্র' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চরিত্রকে অবলম্বন করেই স্রষ্টা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। "ডাকঘর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমল। আলোচ্য নাটকটি একটি প্রতীক- নির্ভর নাটক। এই নাটকের মূল বর্ণিতব্য হল, খণ্ড সত্তার, অখণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা বা সীমার, অসীমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কাহিনী।

এই নাটকে, অমল একটি অনাথ বালক। সে অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ একটি বালক। মাধবদত্ত তাকে দত্তক নিয়েছে। মাধবদত্ত ও তার স্ত্রী, গ্রাম সম্পর্কে অমলের পিসেমশাই ও পিসিমা। নাটকের কাহিনীতে যখন অমলের আগমন, সে তখন থেকেই শারীরিক ভাবে অসুস্থ। বাত, পিত্ত, শ্লেষ্ম তার শরীরে এমনভাবে প্রকুপিত হয়েছে যে, তার বাইরে যাওয়াও নিষেধ। কবিরাজ তাকে বারণ করেছে এমনকি ঘরের বাইরে যেতে। কিন্তু তার শিশুমন সেই বাধা মানতে চায় না। সে বড় পৃথিবীর জীবন স্পন্দন অনুভব করতে চায়। ঘরের বাইরে ছড়িয়ে থাকা অজস্র সূক্ষ্ম বিষয়েই সে পরম আনন্দের সন্ধান পায়। বাইরের পৃথিবী সদাই যেন তাকে দুহাত বাড়িয়ে ডাকে।

কবিরাজের নিষেধকে মান্যতা দিয়ে অমল ঘরের বাইরে যায় না। ঘরের জানালাতে বসেই জীবনের বিচিত্র ছন্দ উপলব্ধি করে। সেখানে বসেই সে দেখতে পায় বিচিত্র সব মানুষকে। কেউ কাজ খুঁজে বেড়ানো পথিক। কেউ বা দইওয়ালা। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তাদের বিপুল যোগ, অমলকে উন্মনা করে দেয়। তাদের দৈনন্দিনতার মধ্যেই অমল জীবনের নিপুণ ছন্দ যেন অনুভব করতে পারে,- সেই যেখানে ডুমুর গাছের তলা দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরনার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে- তারপরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল'। পথিকের এই পথচারী জীবন দেখে, অমলেরও ইচ্ছা করে অমন করে বের হয়ে যেতে। আবার প্রহরীকে দেখেও তার বড় ভালো লাগে। সে কেমন ঘন্টা বাজিয়ে সবাইকে সময়ের জানান দিয়ে যায়। আবার ফকিরের কথা শুনে, ছিদামের কথা শুনে, তার ভিক্ষা করে বেড়াতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু সব থেকে ভালো লাগে তার ডাক। হরকরার কাজ কেবল দেশ জুড়ে রাজার চিঠি বিলি করে বেড়ানো।

আবার কেবল মানুষের বিবিধ পেশা নয়, তার ইচ্ছা করে কাঠবিড়ালী হতে। তার ইচ্ছা করে ক্রৌঞ্চদ্বীপের পাখি হতে। অমল বলে, "আমি যদি কাঠবিড়ালী হতুম তবে বেশ হত' কিংবা ক্রৌঞ্চদ্বীপের পাখির গল্প শুনে বলে ফকিরকে, 'আমি যদি পাখি হতুম তাহলে..' আসলে জীবনের মুক্ত ছন্দ অমলকে আকুল করে। তারই টানে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে চায়।

একদিকে সুদূরের প্রতি অমোঘ টান। অপরদিকে, সংসারের অচলায়তনের অনুশাসন। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বেই বিক্ষত হয় অমলের সত্তা। মাধবদত্ত, অমলের পালকপিতা, অমল যাকে পিসেমশাই সম্বোধন করে, তিনি অমলকে অত্যন্ত স্নেহ করলেও তিনিও অমলের এই স্বপ্নকে গুরুত্ব দিতে চান না। বরং, অমলকে তিনি চালিত করতে চান, সামাজিক নৈমিত্তিকতার অনুকূলে। তিনি অমলকে দেখতে চান পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠিত রূপে।

অমলকে ঘিরে এই নাটকে যে সকল চরিত্রের আনাগোনা হয়েছে, তাদের তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়:যারা অমলকে ভালোবাসে অথচ অমলের ভাবনার সঙ্গে তাদের মিল হয় না, যারা অমলের ভাবনাকে আমল দেয় না এবং তাকে আঘাত করতে চায়, আর অমলের ভাবনার যারা অনুপন্থী ও পথপ্রদর্শক। এই তিনশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় অমলের ভাবনা বিবর্তিত হয়েছে।
কবিরাজ অমলকে বাইরে বেরোতে দিতে চান না। তিনি তাকে ঘরে বন্ধ করে অসীমের থেকে দূরে ঠেলে দেন। মোড়ল, অমলের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে স্পর্ধার আভাস পান। তিনি বিদ্রুপ করে, ভয় দেখিয়ে অমলের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে রাখতে চান। অমলকে বিক্ষত করে, মোড়ল আমোদ পায়। অমলের প্রশ্নের উত্তরে মোড়ল বলে, - 'রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে! তা লিখবে বৈকি! তুমি যে তার পরম বন্ধু! কদিন তোমার সঙ্গে কদিন দেখা হয়ে রাজা শুকিয়ে যাচ্ছে, খবর পেয়েছি। আর বেশি দেরি নেই,' মোড়লের কথার রূঢ়তা , অমলের মনকে ব্যথিত করে, তাই সে প্রত্যুত্তরে বলে,- মোড়লমশায়, তুমি অমন করে কথা কচ্ছ কেন! তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?
আবার সুধা, দইওয়ালা, প্রহরী- এরা অমলের ভাবনার স্বরূপ বুঝতে না পারলেও তাকে আঘাত করে না। বরং অমলের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও সমবেদনা লক্ষ্য করা যায়। তাদের সাধ্যমত ভালোবাসা দিয়ে তারা অমলকে ঘিরে রাখতে চায়। তাদের কাছেই অমল পায় মর্ত্যজীবনের মাধুর্যের আভাস। মচারী কবিরাজ বা মোড়ল, অমলের জীবনে যে প্রতিকূলতা

তৈরি করে, এরা তা করে না। মর্তজীবনেও অমর্ত্যের যে রস, যে সুধা ছড়িয়ে আছে- অমলকে তার স্বাদ জানায় এরা। সুদূরচারী অমলের মনকে এরাই স্নেহ মমতা- প্রীতি রসে সিক্ত করে রাখে। অমল ফকিরকে জানায় যে, দইওয়ালা তাকে কথা দিয়েছে যে , তার ছোট বোনঝিটির সঙ্গে সে অমলের বিবাহ দেবে। সে হবে অমলের রাঙা টুকটুকে বৌ, তার নাকে নোলক , তার লাল ডুরে শাড়ি। ..' তার হাত ধরেই অমল যেন এক রূপকথার জগতের সন্ধান পায়। একইভাবে, সুধাকে দেখেও এক অমলের মনে এক সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে, সুধাকে অমল বলে- ফুল তুলতে চলেছ? তাই তোমার পা দুটি অমন খুশি হয়ে উঠেছে, যতই চলেছ মল বাজছে – ঝম্। ঝম ঝম্। আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম তাহলে উঁচু ডালে যেখানে দেখা যায় না সেইখানে থেকে আমি তোমাকে ফুল পেড়ে দিতুম'। দুই ক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয়, মর্তের সুন্দরে অদেখা, অচেনা এক সুর সংযোজিত করে দিতে চাইছে অমল।
শেষতঃ যে চরিত্রেরা অমলের ভাবনার অনুসারী, ঠাকুর্দা ও রাজ কবিরাজ এর কথা আলোচনা করা যেতে পারে। ঠাকুর্দা, অমলের চেতনার উপযুক্ত সহচর। অমলের আকাঙ্ক্ষা যে অমূলক নয়, প্রথাবদ্ধ সমাজে অমলের সহকারী হয়ে এই প্রবীণ মানুষটি সেই কথাটিই বোঝাতে চায়। তাঁর বয়সের প্রৌঢ়তা দিয়ে অমলের চেতনা ও বিশ্বাসকে অটুট রাখে। সমাজের প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে অমলের হয়ে লড়াই করে। উপরন্তু সুদূরের যে স্বরূপ, অমলের অজানা, তারও সন্ধান পায় অমল, ঠাকুরদার হাত ধরে। ঠাকুরদা অমলকে শোনায় ক্রৌঞ্চদ্বীপের গল্প, সে ভারি আশ্চর্য দেশ- সে পাখিদের দেশ সেখানে মানুষ নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর ওড়ে। অমল, রাজার স্বরূপেরও সন্ধান পায় ঠাকুরদার হাত ধরে; তিনিই অমলকে আশ্বস্ত করেন এই বলে,-"বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই। দিয়ে দেবেন। অমলের অধ্যাত্মযাত্রার তিনি উপযুক্ত সঙ্গী।

রাজ কবিরাজ অমলের সমস্ত আকুলতার, যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি অমলের জীবনের কাঙ্ক্ষিত সুরটি বেঁধে দিয়েছেন। তিনিই অমলকে জানিয়েছেন, রাজা এলেই অমলকে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে। রাজ কবিরাজ, অমলের সকল প্রত্যাশা , সকল অপেক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিপাদন করে, অমলের জীবনকে পূর্ণতার অভিমুখী করেছেন। তাই তিনি আসবার পর, অমলের সকল যন্ত্রণার উপশম ঘটে, সে ঘুমিয়ে পড়ে- এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এল,এল, ওর ঘুম এল। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও - এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে।

এইভাবে, আলোচ্য নাটকে অমলের দ্বন্দ্ব নাট্যায়িত হয়েছে। অমল চরিত্রে যে কয়টি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল সরল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই সে আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। অমল, সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ। সে অসাধারণত্ব তার মানসিক ঐশ্বর্যে। সে প্রথার শাসনে বাঁধা সমাজে, অনন্তের সুর শোনে এবং অপরকেও শোনায়। সংসারের মালিন্যে, ক্ষুদ্রতায় তাকে সংকীর্ণ করতে পারে না। সেই সবার মাঝে শুনিয়ে যায় অসীমের বার্তা। ক্ষুদ্র সংসার তার চলার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে না। কি স্নেহ, কি ত্রাস, কি মায়া সব বাধা জয় করে, অমল তার গন্তব্যের পথে ঠিকই যাত্রা করে। বালক অমলের চরিত্রে নাট্যকার, এই তত্ত্বটিকেই বাঙ্ময় করে তুলেছেন।

নাট্যকারের মুন্সিয়ানা এখানেই যে, তত্ত্বকে মূর্ত করতে গিয়ে তিনি বাস্তবতাকে পরিহার করেন নি। অমলকে আগাগোড়া বালকের বৈশিষ্ট্যেই রেখেছেন। বালক মনের অনুসন্ধিৎসা, সমাজ অনুশাসনের বিপরীতে স্বতঃস্ফূর্ত জীবনবোধ, অকপটতা, ক্রীড়াশীলতা, সরল বিস্ময়, অকৃত্রিম আনন্দ, - প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি অমল চরিত্রের স্বাভাবিক নাটিক বিকাশে সহায়ক হয়েছে।

অমল চরিত্রের বিকাশে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বাল্য – কৈশোরের অভিজ্ঞতাও বিজড়িত হয়ে আছে। বলে আমাদের মনে হয়। ছুটি' গল্পের ফটিক, 'অতিথি' গল্পের তারাপদ, 'অচলায়তন' এর পঞ্চক এরা অমলের সমানধর্মা। এই নাটকে অমলের দ্বন্দ্ব তার নিজের সঙ্গে। তাই অমল কাউকে প্রভাবিত না করে, নিজেই বিবর্তনের পথ ধরে, নিজেকে তার কাঙ্ক্ষিত জীবনে উত্তীর্ণ করেছে। নাট্যকারের অভিপ্রায় অমলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠায়, এই চরিত্রটিকেই আমরা কেন্দ্রিক চরিত্ররূপে বিবেচনা করতে পারি।